Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-I, October 2025, Page No. 18-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.01W.027

রবীন্দ্র চেতনায় মহাকাশ ভাবনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৃত্য-ছন্দ রচনার প্রেক্ষাপট: নটরাজ কল্পনা

ড. সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.07.2025; Accepted: 30.09.2025; Available online: 31.10.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Rabindra's philosophical thought, in every particle of the universe, Nataraj has taken the rhythm of his dance from the finite world to the infinite expanse.
The poet has used a mantra from the Mandukya Upanishad, "Shantang shivamdvaityam" in his workRabindranath has expanded the understanding of Nataraja in aesthetic thought. Therefore, the spread of Nataraj consciousness in his entire creation is profound. The poet has understood the infinite along with a scientific perspective from the perspective of a philosopher.

Keywords: Upanisad, Rhythm, Aesthetic, Ancient-mantra, Space thinking

রবীন্দ্রনাথের নটরাজ চেতনা এবং মহাকাশ ভাবনার আলোচনাকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা যায় কবির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনার ভিতর দিয়ে।

কবিভাবনার বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিভঙ্গী:

"নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাওসকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্তসুরের ছন্দ হে।"[১]

মহাকাশে যুগযুগ ধরে নটরাজের নাচের মধ্যে নক্ষত্র মুক্তিলাভ করে, আর নৃত্যেসূর্য মুক্তিলাভ করে। শিব স্বয়ং মুক্ত বলেই তাঁর কাছে মুক্তির দীক্ষা নেওয়া যায়। জ্যোতিষ্ক লোকে নটরাজের মুক্তির ছন্দময় সুর-বাণী ধ্বনিত হয়।

"নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।"[২]

কবি এখানে বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সত্যতা এবং কবির কল্পনাশক্তি সমন্বিত হয়ে নটরাজভাবনা এখানে 'বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে' বিশ্বসৃষ্টির মূলে অবস্থান করছে। মহাকাশে যে সৃষ্টি-ধ্বংসের লীলা চলছে, কবিকল্পনায় মহাকাল নটরাজ হলেন এই লীলার নায়ক। নটরাজের চরণ বন্দনা করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, যেন অসীম মহাকাশের সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যে নৃত্যের ছন্দ-গতিসঞ্চারিত হয়।

মহাকাশের সুদূরতায় কবির ভাবনা নটরাজ চেতনায় নিমগ্ন। পূজার গানগুলিকে আমরা শিবস্তোত্র গান হিসাবে পাই-

"হে মহাপ্রবল বলী
কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য।
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য, গাহে সর্ব দেশ--
স্বর্গে মর্তে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র।

অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ, গীতছন্দে করে প্রদক্ষিণ।
তব অভয়চরণে শরণাগত দীনহীন,
হেরাজা বিশ্ববন্ধু।।"[৩]

"তাঁহারে আরতিকরে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ"[৪]- অসীম মহাকাশে বিরাজমান নটরাজের বন্দনা গানটি পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত। বিশ্ব প্রকৃতি শিবের বন্দনা করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহা দেউল মাঝে সকল জ্যোতিষ্ক, সূর্য-চন্দ্রের মহেশ্বরকে স্মরণ। মহেশ্বর আরতি লাভ করেন অনন্তগগনে অনাদিকাল হতে তাঁর মহিমায় মগ্ন হয়ে, তরঙ্গ ওঠে, তরঙ্গপরে আনন্দের বিচ্ছুরণ ঘটে। ছয় ঋতুর ডালায় সজ্জিত হয় কুসুমের সম্ভার। বর্ণে-গন্ধে গীত ছন্দে নিবেদিত হয় সেই পুষ্পার্ঘ্য। বিহগের কলতানে জলদের গম্ভীর রাগে জলধীর জলচ্ছ্বাসে সম্মিলিত সঙ্গীত মূর্ছনা এক অনন্তসঙ্গীত রচনা করে। বাতাসে বাতাসে আনন্দগান প্রবাহিত হয় গিরি-কন্দরেও সেই বন্দনা গীত ধ্বনিত হয়। শত সহস্র ভক্তগণের আনন্দগান সকল মোহবন্ধ ছিন্ন করে সেই সর্বময়ের চরণে অর্পিত হয়।

কবির গানে নটরাজ তাঁর ধূসর জটাজাল উড়িয়ে বৈশাখী ঝড়ের আলোড়ন তোলেন, বনস্পতির শাখায়-শাখায়। আকাশের বুকে মেঘের মদমত্ততায় উড়ে চলে পাখির দল।

"গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুতবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধা বেগে ছন্দ জাগায় বনস্পতির শাখাতে।।
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অলখ পথের ছন্দ উড়ায় মুক্ত বেগের পাখাতে।।"[৫]
[প্রকাশ-মাঘ, ১৩৪৫, তাসের দেশ]

কবির নটরাজ চেতনা প্রকাশ পায় কবির গানে। যখন আকাশের ভালে মেঘের সাঁজোয়া সাজায়, তখন বিদ্যুতের দমক আর বজ্রের গমকে আকাশের বুকে স্পর্ধিত বেগের ছন্দ বাজে। পাখির ডানায়-ডানায় মুক্ত বেগের ছন্দ দুলতে থাকে। বহিরঙ্গের এই রূপকল্পের মাঝে অন্তস্থল মন্থন করে বেজে ওঠে ছন্দ। কবি বলেন 'ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে মুক্তিরণের যোদধূবীরের ভ্রূভঙ্গে'।

নটরাজের নৃত্যের ছন্দ হোমবহ্নির তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবলকে স্পর্শ করতে চায়। যেন প্রলয়পথে যোদ্ধাবীর রণজয় করবার অভীপ্সার সম্মুখে ছুটে চলে, রুদ্ররথের চাকার ঘর্ষণে রূপকল্পের সৃষ্টি হয়।

আরও একটি গানে মহাকাশের সুদূরতায় মিশেছে নটরাজচেতনা। 'আকাশ হতে আকাশ পথে হাজার স্রোতে ঝরছে জগৎ ঝরণাধারা মতো' গানটির মূলে রয়েছে আদিমন্ত্র 'ওঁভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহিধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।' কবির মহাকাশ চেতনা বিচিত্র পর্যায়ের এই বিশেষ গানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গানের স্থায়ী অংশটিতে বলা আছে-

"আকাশ হতে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারার মতো।।
'আমার হৃদয়তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত'
ওই আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত।।
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে, শান্তিনামানে।।"[৬]
[রচনাকাল- আশ্বিন, ১৩২৫]

কবি তাঁর ঈশ্বরচেতনার বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণুতে অণুতে। মহাবিশ্বে মহাকাশে সেই প্রাণসত্ত্বার প্রভাব কবি হৃদয়কে বিস্ময়াপন্ন করেছে। গানের শেষ অংশ বিশ্বজুড়ে নটরাজের নৃত্যের মহিমা কবি চিত্তকে জাগরুক রাখে, যে স্রোতে আকাশ নিমজ্জমান, কবির হৃদয়ও সেই ধারায় ডুবে থাকে, শান্তিতে বসতে দেয় না, মহাকাশে জেগে ওঠে মহাকালের নৃত্যছন্দের ব্যাকুল সুর, সেইধ্বনিতে জাগ্রত কবিচিত্ত-

কবির গানের সুরে মহাকাল মাঝে নটরাজের লীলা খেলা চলে যুগ যুগ ধরে। গান-

"আঁধারের লীলা আকাশে আলোক রেখায় রেখায়,
ছন্দের লীলা অচল কঠিন মৃদঙ্গে।....
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়,
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয় ভ্রূভঙ্গে।"[৭]
[প্রকাশকাল- ১৯ মার্চ ১৯২৬]

মহাকাশের সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব থেকে শুরু করে পরমাণু তত্ত্বের খবর কবির অবগত ছিল। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কবির উক্তি-

"আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেককাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতিহীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"[৮]

'বিশ্বপরিচয়'-এর পরমাণুলোক আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"বিশ্বসৃষ্টির আদি-অন্তে-মধ্যে-প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় তেজের কাঁপন। পাথর হোক, লোহা হোক, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শস্থল। কিন্তু এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাদের অনু পরমাণু, অর্থাৎ অতি-সূক্ষ্ম পদার্থ, যাদের দেখতে পাই নে, অথচ যাদের মিলিয়ে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরী, তারা সকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। আলোর ঢেউয়ের আপন দলের আরো একটি ঢেউ আছে। সেটা চোখে দেখিনে, স্পর্শে বুঝি। সেটা তাপের ঢেউ। সৃষ্টির কাজে তার খুবই প্রতাপ।"

কবির গানে পাই-

"নাচে আলো নাচে, ও ভাই,
আমার প্রাণের কাছে-জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয় বীণার মাঝে-
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।"[১০]

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে যে তেজের কাপন আছে তা-ই হচ্ছে নটরাজের নৃত্য। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যদ্বার খুলে দেই এই নৃত্য। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে কবি অণু-পরমাণু নিয়ে আলোচনা করেছেন-

"বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র; তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে, যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।"[১১]

নটরাজের সৃষ্টি ও ধ্বংস, তথা মৃত্যু ও জীবনের ধারণার সাথে পরমানু বিজ্ঞানের এক গভীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন কবি।

গানের লাইন-

'তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়

যুগে যুগে কালেকালে

সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান
পায়ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।।
নৃত্যের বশে সুন্দরহল
বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিলচন্দ্রভান।'

নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রনের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের মধ্যে জীবনের বিশ্বনৃত্যে বাঁধন পরানো এবং বাঁধন খোলার ভাবনা আছে। নৃত্যরত শিব এখানে সুন্দর। তাঁর লীলাবিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। কবি বলেছেন- "নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু, পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।"[১২]

ভাণ্ডের মধ্যে প্রতিটি পরমাণুর বিদ্রোহী সত্ত্বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে। এই 'পরমাণু বিদ্রোহ' হল অবিরাম রুপান্তর প্রক্রিয়া, তাপের কারণে প্রোটন-নিউট্রন স্বধর্ম ত্যাগ করে রুপান্তরিত হয়। ঠিক সেই রকম সূর্যের আসল উপাদান হাইড্রোজেন, আলফা কণায় রুপান্তরিত হয় কেন্দ্রীয় প্রচণ্ড তাপে, এই রুপান্তরই হল পরমাণু বিদ্রোহ। কবি কল্পনা করেছেন, কিভাবে ইলেকট্রনগুলি বিদ্রোহী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রোটনের মুখোমুখি হয়, এবং কক্ষচ্যুত হয়ে অন্য ভিন্ন প্রোটনের অভিমুখে যাত্রা করে। কবির কল্পনায় সুদূর মহাকাশেই নয়, পৃথিবীতেও অনুরূপ সৃষ্টি-ধ্বংসের লীলা চলছে।

সূর্য-নক্ষত্র সম্পর্কে কবি 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে অনেক আলোচনা করেছেন- সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাত রঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। পৃথিবী থেকে যে ৯২ টি মৌলিক পদার্থের খবর পাওয়া গেছে সূর্যে তার সবগুলিই থাকা উচিত; কেননা পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত।

নৃত্যছন্দ রচনায় কবির নটরাজ কল্পনা:

'নৈবেদ্য' কাব্যের ২৩ সংখ্যক কবিতায় কবি মহাকালের নৃত্য অনুভব করেছেন সূর্য-গ্রহ তারকামণ্ডলে আপনার অন্তর্লোকে, কবির দাবী এখানে নটরাজের নৃত্য হলো অণু-পরমাণুর নৃত্য। শশী-ভানু, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু চির অক্ষয় নটরাজের কেন্দ্রে বিরাজ করে, কিছুই হারিয়ে যায় না, কারণ নটরাজ স্বয়ং পূর্ণসত্ত্বা রূপে বিরাজমান। মানুষের ছোট্ট ছোট্ট হারাধনও সেই পূর্ণসত্ত্বা মহাকাল শিবের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে যুগ-যুগান্তর ধরে।

"হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে
যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে
নাইনাই ভয়, সে শুধু আমারি,
নিশিদিন কাঁদি তাই।"[১৩]

কবির চোখে নটরাজ হলেন 'ছন্দোলীলার নটরাজ'। মানুষের সমাজে, শিল্পসাহিত্যে, বিশ্বের সকল কর্মে নটরাজের ছন্দের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। মাটির তুচ্ছ তৃণ থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এই ছন্দ বর্তমান। গ্রহের আবর্তন এবং অণু-পরমাণুর মধ্যেও ছন্দ আছে। গতির সুপরিকল্পিত ছন্দে জ্যোতিষ্কলোকের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। নটরাজ মহাকালরূপে গ্রহলোকে এবং মনুষ্যলোকে এই ছন্দ রক্ষা করে চলেন।

"মমচিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।"[১৪]

কবির গানে নটরাজ কখনো শিবের নৃত্যছন্দ, আবার কখনো ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ছন্দময় নৃত্যের তালে অণুপরমাণু থেকে গ্রহ-গ্রহাণুপুঞ্জের গতির বিহার। এই নৃত্যছন্দ প্রবল আলোড়ন তুলে কবি হৃদয়কে আলোড়িত করে, তিনি অনুভব করেন মৃদঙ্গের তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ তালে প্রবল সেই শক্তির নৃত্যলীলা। গানের সঞ্চারীতে বলতে শুনি-

"হাসি কান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে"[১৫]

হাসি কান্না, হীরা পান্না ছন্দে ছন্দে আবর্তিত। ভালোমন্দ সুখ-দুঃখ সকল বৈপরীত্য একাকার হয়ে যায় এই ছন্দিত নৃত্যের তালে তালে। মানব জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি, জন্ম ও মৃত্যু অপরূপে জীবন গতিকে দোলায়িত করে। এই নৃত্যের তালেই আছে মুক্তির অপরূপ প্রকাশ। দিনরাত্রি সেই। মুক্ত ছন্দেই রচিত হয় আনন্দের পূর্ণ অনুভব, সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে, তেমনি তাতা থৈথৈ জীবন, অনুরণিত হয়। গানের শেষ অংশে কবি তাই বলে ওঠেন-

"কি আনন্দ কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি
যে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে তাতা থৈথৈ"[১৬]

সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই তাঁর সৃষ্টিকর্মে তথা গানে, নাটকে নৃত্যের ভাবনাটিকে জাগ্রত করে রেখেছেন। রবীন্দ্র নাট্যপর্বে নৃত্যকে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকলার মর্যাদায় ভূষিত করার আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। এই আয়োজন পূর্ণতা পেয়েছে 'নটীর পূজা' য় (১৯২৬), 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' (১৯২৭), 'শাপমোচন' (১৯৩১), 'শিশুতীর্থ' (১৯৩১) ।

কবির নৃত্যচেতনার পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছে নৃত্যনাট্যগুলিতে। নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) এবং 'শ্যামা' (১৯৩৯)-য়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন-

> "সংগীতের সঙ্গে নৃত্য অচ্ছেদ্য। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে-সব নাট্যাভিনয় হইত তাহার মধ্যে বাউলসংগীতে বা জনতার সমবেতসংগীতে অপটু নৃত্যছন্দ সহজে আসিয়া পড়িত। সে নৃত্যের জন্য কোনো শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। শারদোৎসবে বালকেরা যে গান গাহিত তাহার মধ্যে খানিকটা action থাকিত, সেটা কবিই স্বয়ং শিখাইতেন; তবে উহাকে নৃত্য বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর ও 'ফাল্গুনী'-তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নৃত্য করেন, সে রীতি তাঁহার নিজস্ব।"[১৭]

মহাকালের নৃত্যচেতনা আলোচনা প্রসঙ্গে কবির নৃত্য সম্পর্কে অভিমত প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে পড়ে। বিশ্বপর্যটক কবি জাপান যাত্রাকালে তাঁর 'অন্তর বাহির' প্রবন্ধে সমুদ্রের নৃত্যরূপ দেখেছেন, তাকে কবি অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছেন, সমুদ্রকে কবির মনে হয়েছে 'নৃত্যলোক'। নটরাজের নৃত্যে জাগ্রত ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তিন লোক। অনন্ত বিশ্বলোকে মহাকালের নৃত্যচেতনাকে কবি তার লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আমরা খুঁজে পাই দুই হাতে দুটি মন্দিরা বাজাতে থাকা মহাকালকে, নটরাজ দুই হাতে দুইটি মন্দিরা বাজাতে থাকেন আবর্তনের নৃত্যছন্দে-

"দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে"[১৮]

তাঁর মন্দিরার আঘাত সৃষ্টছন্দে নিদ্রা ছুটে যায় নিত্যনূতন সংঘাতে জীবনের প্রবাহ জাগরুক হয়ে ওঠে। মহাকালের মন্দিরার এই সঙ্গীত মূর্ছনা ফুলে ও কাঁটায় আলোতে এবং ছায়াতে, জোয়ার জলে অথবা ভাঁটার প্রতিকূল স্রোতে, প্রাণের মাঝে অবিরাম বাজতে থাকে সুখ-দুঃখের শঙ্কাকে উপেক্ষা করে। ভোরবেলা থেকে নিশীথকাল পর্যন্ত মহাকালের এই নৃত্যলীলা অব্যাহত। সকাল থেকে সন্ধ্যায় ছন্দবদ্ধ, তালবদ্ধ এই সাংগীতিক প্রয়াস রূপসাগরে ঢেউ তোলে। কবি বলেন-

"তালে তালে সাঁজ-সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই
ছন্দে নানান রঙ জাগে।
এইতালে তোর গান বেঁধে নে- কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে।"[১৯]

নটরাজের নৃত্য চেতনাকে কবি যে গভীরে অনুভব করেন, তার নিদর্শন আমরা পেতে পারি কবির লিখিত চিঠিপত্র থেকে-

"প্রমথ, নাচ সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে খুসি হলুম। উদয়শঙ্করের নাচের প্রধান গুণ হচ্চে এ নাচে তার আত্মশক্তি ও তার শিক্ষা দুইই মিলেছে। আঙ্গিকের দিকে উৎকর্ষ প্রাপ্ত এ জিনিসটা ভাবিক দিকে ক্ষুণ্ণ। ওর য়ুরোপীয় নৃত্যসঙ্গিণী সিমকি বাইজিদের যে ভাওবাৎলানোর নকল করেছে সেই ভাওবাৎলানোতে ভাবের গভীরতা নেই তাতে নারী অঙ্গে কামনার লহরীলীলা প্রকাশ পায়। কামনা উদ্রেকের দ্বারা মন ভোলানো আর্টের ইতর পন্থা। যে কল্পনাবৃত্তির উৎকর্ষ থেকে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, উদয়শঙ্করের নাচে এখনো তার অপেক্ষা আছে। প্রোগ্রামের আরম্ভেই সেদিন নৃত্যকলাকে বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ চালনার বাহাদুরী দেখিয়েছিল, কোনো যথার্থ আর্টিষ্ট এ কাজ করতে লজ্জা পেত উপাদানকে উপকরণকে রূপসৃষ্টি যদি না ভোলে, তবে তো সৃষ্টিই হয় না।"[শান্তিনিকেতন, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, পত্র সংখ্যা-১১০, চিঠিপত্র-পঞ্চমখণ্ড]

'সংগীত চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'জাপানযাত্রীর ডায়েরি' থেকে ধারণা পেতে পারি নৃত্যের চেতনা, কি গভীর ভাবে কবি হৃদয়ে সম্পৃক্ত হয়েছে-

"একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। ভঙ্গি বৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্থ দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্দ্ধনারীশ্বরের মতো!!"[২০]

[জাপান, ২৯ মে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ কবিত্ব ও ছন্দোচেতনায় উদ্বোধিত হয়ে নৃত্যের আদর্শকে নটরাজের মধ্যে খুঁজে নিয়েছেন। 'তপতী' নাটকে স্থান পেয়েছে একটি প্রাসঙ্গিক গানটি হল-

"প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।।"[২১]

নটরাজের রূপকল্পনা আমাদের তাঁর বৃহৎ সত্ত্বাকে অসাধারণ এক চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত করে। নৃত্যছন্দে তাঁর জটার বাঁধন মুক্ত হয়ে বিস্তৃত হয় আকাশে। তাঁর জটা থেকে জাহ্নবী প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়। তার তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে সঙ্গীতের সুরমুর্ছনা জাগে।আবার কবি নটরাজকে বলেছেন জীবন দেবতা। কবি শান্তিনিকেতনে বসে ১৩ আষাঢ় ১৩১৭ সালে রচনা করেন একটি গান, মাঘোৎসবে গীত হয়। গানটি হল:

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ।
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।।"[২২]

পূজা পর্যায়ের গানটি কবি জীবনদেবতার উদ্দেশ্যেই রচনা করেন। কবির জীবনদেবতা হলে 'নটরাজ'। যিনি একাধারে নৃত্যে-ছন্দে যেমন নিজেকে প্রকাশ করেন, তেমনি বাণীর মধ্যে নটরাজ নিজেকে প্রকাশ করেন-

ত্রিভুবনেশ্বর তথা নটরাজের লীলা চলে কবির সঙ্গে মিলিত হয়ে, ভক্তের ভগবানকে ভক্তের টানে নিচে নেমে আসতে হয়, কবিকে ছাড়া ঈশ্বরের প্রেম সার্থক হয় না, সেই জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে কবির প্রেম-

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে-
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতে যে মিছে।।"
[১৩১৭ সালে রচনা। পূজা পর্যায়, অখণ্ড গীতবিতান, পৃঃ-১২৩]

আবার ছন্দের নটরাজের নৃত্যছন্দ, স্পন্দিত হয় বিশ্বজুড়ে। জ্যোতিষ্কলোকে চন্দ্র-সূর্য-তারারা সেই নৃত্যের ছন্দে সুরের আগুন জ্বেলে দেয়- 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে'। [শান্তিনিকেতন, ১৮ ভাদ্র ১৩১৬]। রবীন্দ্র রচনায় নটরাজের হাতে যে বীণার তন্ত্রী থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সুর বাজে, সেখানে একদিকে যেমন আছে করুণ মিনতি ও আকুতি, তেমনি আছে রুদ্রবীণার নিষ্ঠুর ধ্বনি, যার কঠিন আঘাতে আমাদের মোহের আবরণ থেকে

সর্বভুলের ঘোর কাটিয়ে নটরাজ তাঁর অন্তর্লোকে ডাক দেন। চৈতন্যলোক মহাকালের বীণার সুর আঘাত হেনে আমাদের জাগিয়ে তোলে।

'প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে' গানটি পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও কবির নটরাজ চেতনা এই গানে প্রকাশ পেয়েছে, 'নটরাজ' কে কবি এখানে 'প্রভু' বলে মেনে নিয়েছেন। মহাকালের রুদ্রবীণা বাদনে ফোটে আঁধার মাঝে তারা। কবি বলেছেন- 'ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া, গুঞ্জরিয়া, গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া'। গানটিতে নটরাজের নাচের আনন্দে কবিচিত্ত ভরপুর। এভাবেই মহাকাল নটরাজ কখনো জীবন দেবতা রূপে, কখনো প্রিয়রূপে, কখনো বা প্রভুরূপে সীমার মাঝে অসীমের লীলায় কবিচিত্তে বীণার সুর বাজায়ে, ডমরুর তালে তালে নৃত্য করে। রূপলোকে, নটরাজের সৌন্দর্যমূর্তির ছবি ভেসে ওঠে। কবির গান-

'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি, হে নিরুপম, নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে।।' [প্রকাশকাল ১৩৩৩ বৈশাখ, শান্তিনিকেতন। নটীর পূজা, শ্রীমতীর গান] গানটিতে কবির নটরাজ চেতনা আরো আস্তীর্ণ ও সুগভীর হয়ে ধরা দিয়েছে। কবি রুদ্রকে নিরুপম বলেছেন, রুদ্রের নৃত্যরসে কবির চিত্ত আনন্দ চেতনায় নিমগ্ন। গানটির স্থায়ীর এই বিশেষ লাইনটি শুনলেই ধরা পড়ে কবির নৃত্য-ছন্দ বিষয়ক নটরাজ কল্পনার ভাবটি-

'ডাইনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।
বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে।।'

কবি নটীর পূজায়, শ্রীমতির জন্য গানটি রচনা করেছেন নৃত্য-ছন্দের পরিবহে। 'ডাইনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে' এই অর্থের দ্যোতনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জন্মান্তরের ছন্দ, যা যুগ যুগ ধরে মহাকালের ছন্দের লীলায় আবর্তিত হচ্ছে। শ্রীমতির নিজস্ব ভঙ্গিতে রুদ্র নটরাজ বন্দিত হয়েছেন, এই সঙ্গীতটিতে।

মহাকাল বা নটরাজ চেতনা রবীন্দ্রচেতনায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে। কবির দৃষ্টিতে, কবি সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে নটরাজ চেতনার অন্তর্গত করে দেখেছেন। ছন্দে-তালে নৃত্যরত মহাকালের বন্দনা গান গেয়েছেন কবি। তিনি মহাকালের নৃত্য অনুভব করেছেন সূর্য-গ্রহ তারকামণ্ডলে এবং আপনার অন্তরলোকে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে কবি অসীমের উপলব্ধি করেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সাথে নিয়েই।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান-অখণ্ড। বিশ্বভারতী: আশ্বিন ১৩৩৮/শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৫৪৩ (বিচিত্র)।
২. তদেব, পৃ. ৫৪৪ (বিচিত্র)।
৩. তদেব, পৃ. ১৮৬ (পূজা)।
৪. তদেব, পৃ. ১৮৭ (পূজা)।
৫. তদেব, পৃ. ৫৬৬ (বিচিত্র)।
৬. তদেব, পৃ. ৫৫৯ (বিচিত্র)।
৭. তদেব, পৃ. ৫৮৩ (বিচিত্র)।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বপরিচয়। কলকাতা, বিশ্বভারতী: ১৩৫০, পৃ. ১৭২।
৯. তদেব, পৃ. ১৮।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান-অখণ্ড। বিশ্বভারতী: আশ্বিন ১৩৩৮/শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৫৬৪।
১১. তদেব, পৃ. ৬৩।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান-অখণ্ড। বিশ্বভারতী: আশ্বিন ১৩৩৮/শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৫৪৩।
১৩. তদেব, পৃ. ২৩৪ (পূজা)।
১৪. তদেব, পৃ. ৫৪৫ (বিচিত্র)।
১৫. তদেব, পৃ. ৫৪৫ (বিচিত্র)।
১৬. তদেব, পৃ. ৫৪৫ (বিচিত্র)।
১৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার। রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা, বিশ্বভারতী: ১৩৬৩, পৃ. ৩০১।
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান-অখণ্ড। বিশ্বভারতী: আশ্বিন ১৩৩৮/শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৫৪৫ (বিচিত্র)।
১৯. তদেব, পৃ. ৫৪৫ (বিচিত্র)।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সংগীত চিন্তা। কলকাতা, বিশ্বভারতী ১৩৭৩, পৃ. ২০৫।
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতবিতান-অখণ্ড। বিশ্বভারতী: আশ্বিন ১৩৩৮/শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৫৪৫ (বিচিত্র)।
২২. তদেব, পৃ. ৪০ (পূজা)।